www.banglaeye.com

তবু ভাল থেকো

তসলিমা নসরিন

কেবল তো আকাশ-আকাশ-মানুষ নিয়েই আমার জীবন নয়। আমি তো ধুলো মাটির মেয়ে, গাছে চড়া, ফুর্তি করা, সাঁতার কাটা দস্যি জাতের মেয়ে। অসাধারণ মানুষ নিয়ে আমি সত্যিই বেশি দিন চলতে পারি না। সাধারণের কাছে আমাকে ফিরতে হয়। ফিরতেই হয়। আমার কলকাতার জীবন বরাবরের মতোই সাধারণে উথলে উঠেছে। অসাধারণ কিছু পুরনো বন্ধু নাহয় হারিয়েছিই আমি, তাতে কী, আমার তো অগুনতি সাধারণ ছিল। সাধারণের ভিড়েই আমি স্বস্তি পেয়েছি, সুখ পেয়েছি। এ বারও আগের বারের মতোই বিশ্ব ছিল, গোপা ছিল, গভীর রাত্তিরে হই হই করে ঘুম ভাঙিয়ে যাদের আমি হরিনাভির বাগানে নিয়ে যেতে পারি চাঁদ দেখাতে। পাকের ঘরে-র ঝর্না ছিলেন, দু'বেলা তাঁর পাঠানো খাবার খেতে খেতে মনে হয়েছে নানির বাড়ির পিঁড়িতে বসে বুঝি জগতের শ্রেষ্ঠ খাবারগুলো খাচ্ছি। ঝর্নার হৃদয় থেকে যে স্নেহের ঝর্না ঝরেছে, তাতে দু'বেলাই স্নান করেছি আমি। কলকাতায় যত বারই যাই, নতুন নতুন বন্ধু গড়ে ওঠে। হৃদয়ের দুয়োর আমি খোলা রাখি নিশিদিন, যেন যে কেউ যখন খুশি টুপ করে ঢুকে যেতে পারে। কত কেউ যে ঢুকে গেছে। কত কেউ যে পরশ দিয়েছে প্রাণে।

সংগ্রাম ছায়ার মতো ছিল পাশে। ভাস্কর ছিল, শিল্পী ছিল। রেখাচিত্রে মর অরুণ চক্রবর্তী তাঁর স্নিগ্ধ সুন্দর মোহন মধুর রূপটি নিয়ে এসে ঘর আলো করে দিত। অরুণ এক আশ্চর্য শিল্পী। কী নিখুঁত কাজ যে সে

করতে জানে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। অরুণের বাড়িতে সামান্য ক্ষণের জন্য গিয়েও মনে হয়েছে বাড়ির সবাই কত আপন আমার। যেন যুগ যুগ ধরে তাদের আমি চিনি। আচ্ছা, মনে মনে বলি, তোদের এত চিনি কেন, তোরা কি আমার আগের জনমের কেউ ছিলি। আগের জনমে বিশ্বাস থাকলে ঠিক ঠিকই কিন্তু ভেবেই নিতাম। অরুণের মতো আরও এক ঝাঁক শিল্পীর সঙ্গে এ বার পরিচয় হল, সবাই মিলে এক দুপুরে গঙ্গা ঘুরে এলাম। গঙ্গাকে এত কাছ থেকে আগে কখনও দেখিনি। গঙ্গার গা থেকে কলকাতাকে দেখতে আরও বেশি রূপসী লাগে। আমার আনন্দে বিষাদে ছিল ওরা, কৃপা, কামাল, কৌশিক। ছিল সুশীল, রিংকি, স্বপ্না, স্বাতী। ছিল ওরা, যারা নাক-উঁচু সমাজে না মী নয়, দামি নয়। আমার কাছে কিন্তু হিরের মতো, মুক্তোর মতো।

জবা ছিল, জবার উষ্ণতা ছিল, রাখী ছিল, রাখীর অসম্ভব সুন্দর চোখদুটোর মায়া ছিল। হঠাৎ তুফান তুলে কোথাকার কোন পাচু এসে দুদিনেই একেবারে প্রেমিক হয়ে গেল। হোটেলের ঘরদোর পরিষ্কার করার ছেলে কিশোর সুভাষ ছুটে ছুটে আসত খবর নিতে, দিতে। পুলিশের লোক হয়েও শংকর মানস পুলিশের লোক ছিল না। যাদবপুর থেকে বিলাস আসত। ওর পরনের কাপড় জুতো কম-দামি ছিল বলে ওকে এক দিন হোটেলে ঢুকতে দেয়নি হোটেলের লোকেরা। আমার শত অনুরোধেও যখন কাজ হয়নি, আমি, হোটেলের সম্মানিত অতিথিটি, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বড় ফটকের বাইরে খোলা আকাশের তলে দাঁড়িয়ে থাকা আমার নমস্য প্রণম্য অতিথি বিলাস সরকারকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে সসম্মানে ভেতরে নিয়ে আসি। হোটেলের লোকেরা হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সম্ভব হলে বিলাসের জন্য আমি ওখানে রেড কার্পেট পেতে দিতাম। কী যে অন্ধ দুর্গন্ধ অহঙ্কারের কাদায় মানুষ তলিয়ে থাকে!

আমার সত্যিই রাগ হয় কলকাতায় কোনও হোটেল-জীবন কাটাতে। কেউ কেউ নাকি দূর থেকে টিপ্পনী কাটে। আহা, যেন আমি শখে থাকি হোটেলে। যেন আমার ইচ্ছে করে হোটেলে থাকতে! যেন তোমরা কেউ বাড়িয়ে দিয়েছিলে তোমাদের দু'একটি চিলেকোঠা, আমি ঢঙ দেখিয়ে থাকিনি। যারা ধিক্কার দেয়, তারা চিরকালই দেবে। দামি হোটেলে থাকলেও দেবে, বস্তির ভাঙা ঘরে বাস করলেও দেবে।

কিছু নারীবাদী শুনেছি বাজারে বলে বেড়ান যে, আমার নাকি পুরুষের সঙ্গেই সব ওঠাবসা, পুরুষ দেখলেই ঢলে পড়ি, মেয়েদের সঙ্গে নাকি মোটেও মিশি না, মেয়েদের নাকি পুছি না। ভাই নারীবাদীগণ, আমি তো লিঙ্গ দেখিয়া বন্ধুত্ব করি না। যাহার সহিত আমার মনে মেলে,

আদর্শে বিশ্বাসে মেলে, তাহার সহিত বন্ধুত্ব করি। তাহার সহিত কথা কহিয়া আমি প্রভূত আনন্দ লাভ করি। ওহে বান্ধবীগণ, আকারে আকৃতিতে লিঙ্গ যত বৃহৎই হউক না কেন, আমার নিকট লিঙ্গের মূল্য মস্তিষ্ক হইতে অধিক নহে। রে নারীবাদী, আমি অনেক পুরুষকে দেখিয়াছি, যাহারা তোদের তুলনায় অধিক নারীবাদী, আর অনেক নার ীকে দেখিয়াছি, যাহারা পুরুষের তুলনায় অধিক পুরুষতান্ত্রিক।

উফ, আমার যে কী সৌভাগ্য, যে আমি বই পড়ে নারীবাদী হইনি। কী যে সৌভাগ্য যে মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে আমার এই বাদ সেই বাদ নারীবাদ ঝাড়িবাদ মনুষ্যবাদে গিয়ে স্থির হয়েছে। তবু, কোনও বাদে প্রতিবাদে না গিয়ে চুপচাপ যদি ফুটপাথে শুয়ে থাকা ওই শিশুটির কান্না মুছে নিতে পারতাম, এক ফুঁয়ে যদি শিশুটিকে একটি ঘর দিতে পারতাম, মায়ের একটি কোল দিতে পারতাম! সোনাগাছিতে দাঁড়িয়ে থাকা বিষণ্ন তরুণীটিকে যদি অন্ধকার থেকে তুলে এনে সারা কলকাতার আলোয় হই হই করে ঘুরে বেড়িয়ে নেচে গেয়ে ধাবায় খেয়ে ভোর হলে তাকে বাকি জীবনের জন্য একটি নিশ্চিত একটি শোভন সুন্দর অর্থোপার্জন দিতে পারতাম! ইস্টিশনের মোট বওয়া বালকটিকে, জুতো পালিশের বালিকাটিকে যদি বইখাতা দিয়ে ইশকুলে পাঠাতে পারতাম! কত কিছু যে পারতে ইচ্ছে করে আমার! কিন্তু, কী আর পারি করতে! কত আর পারি! কেবল স্বপ্ন দেখি, কেবল স্বপ্ন দেখে মরি।

স্বপ্ন দেখা আরও বন্ধুদের জড়ো করে ইচ্ছে হয় কিছু একটা কাণ্ড করি । কিন্তু কাণ্ড আমাকে করতে দেবে কেন লোকে! দুর্মুখেরা বলছে যে, আমাকে নাকি আর যেতেই দেওয়া হবে না কলকাতায়। আমার জন্য দুয়োর নাকি এ দেশেও বন্ধ হচ্ছে। পাঁচিশ জন বুদ্ধিজীবীর ক্ষমতা তো অনেক, দুয়োর আঁটার ক্ষমতাও হয়তো আছে তাঁদের। কিন্তু পাঁচিশ জন নিয়ে তো পশ্চিমবঙ্গ নয়!

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর বই নিষিদ্ধ করা, আর এ কারণে আশকারা পেয়ে র াস্তায় রাস্তায় কিছু লোকের আমার কুশপুতুল পোড়ানো আর সগৌরবে চুনকালির ফতোয়া দেওয়ায় যাদের সমর্থন ছিল, তাদের সংখ্যা যে খুব

বেশি ছিল না, তা আমার দেখা হয়েছে। বইমেলায় আমি টের পেয়েছি তা। মেলার খোলা মাঠে দেখেছি ভালবাসার ঝোড়ো হাওয়া, দূর দূর থেকে মানুষ এসেছে, কেউ কেবল এক বার স্পর্শ করতে চেয়েছে, কেউ চোখের দেখাটি দেখতে এসেছে, কেউ কেবল বলতে এসেছে, আমরা তোমার সঙ্গে আছি, কেউ কাঁদিয়ে দিয়েছে বলে যে তোমার বই পড়ার জন্য আমি বাংলা শিখেছি। ওরা অনেক। ওরা অসংখ্য। আমার দিকে নেমে আসা ভালবাসার ঢলে আমি ভেসে গেছি, ডুবে গেছি, কূল হারিয়ে কূল পেয়েছি আর সন্দেহাতীত হয়েছি আমি বন্ধু হারিয়েছি ঠিক, কিন্তু যত হারিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি আমি পেয়েছি। এ বারের কলকাতায় আমি অগুনতি মানুষ দেখেছি। সত্যিকারের মানুষ। কিছু উজ্জ্বল নক্ষত্র আমার দেখা হয়েছে। দূর দূর শহর থেকে গ্রাম থেকে মানুষ এসেছে। অসম থেকে আসানসোল থেকে ত্রিপুরা থেকে বর্ধমান থেকে।

ডাক্তার শেখ মুজাফফর হুসেন এসেছেন চব্বিশ পরগনার এক গ্রাম থেকে। সেকুলার-মুখোশ পরা সাংবাদিক এবং লেখকদের আসল চরিত্র বুঝে বড় ক্ষুব্ধ তিনি। মুসলিম মৌলবাদীর উত্থান নিয়ে উদ্বিগ্ন মুজাফফর হুসেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাকে বলতে এসেছিলেন, মৌলবাদী সমাজে বাস করতে গিয়ে মনের সবুজ দিকগুলো ক্রমশ হারিয়ে গিয়েছে। আপনার লেখাগুলো এখন অক্সিজেনের কাজ করছে। মুজাফফর হুসেনের মতো অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যাদের অজুহাত দিয়ে বই নিষিদ্ধের মতো একটি কাণ্ড করেছেন, সেই তারাই আমাকে বলেছে, বই নিষিদ্ধ হোক তারা চায় না, তারা শহিদুল, আকমল, বরকত, পারভেজ, সুলতানা, ফাতেমা, লতিফা— তারা দ্বিখণ্ডিত পড়েছে এবং মনে করছে না একটি বাক্যও ইসলাম সম্পর্কে আমি মিথ্যে লিখেছি। তারা একটি সুস্থ সুন্দর সমাজ চায়, পিছিয়ে থাকা সমাজের মধ্যে একটি জাগরণ চায়, একটি বিপ্লব চায়। তারা যে করেই হোক, সামনে এগোতে চায়, অন্ধত্ব তারা যে করেই হোক ঘোচাতে চায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য না চাইলেও তারা চায়। এ বারের কলকাতায় আমার সব চেয়ে বড় প্রাপ্তি এই। শ্রদ্ধায় আমি মাথা নত করেছি এই উদ্দীপিত তারুণ্যের সামনে, এই সম্ভাবনার, এই আশার, এই বারুদের, এই পূর্বাভাসের সামনে।

মুখে বই নিষিদ্ধ হওয়া সমর্থন না করলেও অনেকে মৌন থেকেছে (মৌনতাই অবশ্য এক রকম সমর্থনের মতোই)। অনেকে কিটকিট করে হেসেছে দূর থেকে। তারা খুব ভয়ঙ্কর আমি জানি, তারা ওই মসজিদের ওই মুফতির চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। আমাকে যখন মৌলবাদীদের হিংস্র আক্রমণের শিকার হতে হয়েছিল বাংলাদেশে,

তখন অনেকেই এমন কিটকিট করে হেসেছিল। আড়ালে হাততালি দিয়েছিল। আজকের এই হুমায়ুন আজাদও হেসেছিলেন। তাঁকে আজ ও দেশে চাপাতির আঘাত খেতে হয়। এই হুমায়ুন আজাদই ক'দিন আগে সমরেশ মজুমদারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দাঁতাল হেসে আমাকে বেশ্যা বলে গাল দিয়েছেন দ্বিখণ্ডিত বইটি লিখেছি বলে।

সে সময়ের কথা বলছি, ধর্মের সমালোচনা করেছিলাম বলে আমাকে হত্যা করার জন্য যখন দেশ জুড়ে তাণ্ডব চলেছে, তখন দেশের বরেণ্য শিল্পী সাহিত্যিক রাজনীতিকরা এক বাক্যে বলে দিয়েছিলেন যে, এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাঁরা মাথা ঘামাননি, নাক গলাননি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে। ঝামেলা আমি তৈরি করেছি, ঝামেলা আমাকেই মেটাতে হবে। সেই ১৯৯৪-এ অন্তত একশোটি মানুষ যদি মুখ ফুটে বলত যে, না এটা তসলিমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, এ আমাদের সকলের ব্যাপার, সকলের বাক্‌স্বাধীনতার ব্যাপার, তবে আমাকে দেশ ছাড়তে হত না।

আমার ভাল লাগছে দেখে যে এত দিনে বাংলাদেশের মানুষ জেগেছে। আজ যখন এক পুরুষের ওপর আঘাত হানা হল, পুরুষটি যতই ননসেন্স কাজ করুক ননসেন্স লিখুক, পুরুষ তো, যতই তার নিন্দুক থাক না দেশে, সব কেমন এক তুড়িতে এককাট্টা দাঁড়িয়ে গেল! গোটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এখন বুনো ষাঁড়ের মতো ক্ষেপে উঠেছে পুরুষের অধিকার রক্ষা করতে— পুরুষের লেখার অধিকার, পুরুষের কথা বলার অধিকার, পুরুষের ফুঁসে ওঠার অধিকার তারা এখন চায়ই চায়। এখন তারা বাক্‌স্বাধীনতার দাবি করছে গলা ফাটিয়ে। চারদিকে হই-হুল্লোড় এখন, সভা-মিছিল, পত্রিকাগুলোয় উপচে পড়ছে প্রতিবাদের কলাম। দেশ গেল দেশ গেল রব, এত দিনে দেশের লোক বুঝতে পেরেছে যে মৌলবাদীরা মন্দ কিছু একটা করছে। তসলিমা নারী ছিল, এই ছিল সমস্যা। তসলিমার মুখে অমন সব কথা মানাত না, পুরুষরা বললে মানিয়ে যায়। আর, সত্য কথা হল, পুরুষের জন্য পুরুষরা বুক চিতিয়ে দাঁড়ালে মানায়, কোনও নারীর জন্য দাঁড়ালে কেমন মেনি মেনি লাগে, মাগী মাগী লাগে।

হুমায়ুন আজাদ আমার যত নিন্দাই করুন না কেন, তাঁর ওপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা আমি করছি। এখন যে ভাবে মানুষ জেগেছে, যে ভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, যে ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে হুমায়ুনের সমর্থনে, তাতে আশার একটি অঙ্কুরোদ্গম দেখি। যে কারণেই হোক না কেন, হোক, ও-দেশে লেখকের লেখার অধিকারের জন্য আন্দোলন হোক, ও-দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা হোক, হোক, পরমতসহিষ্ণুতার

চর্চা হোক।

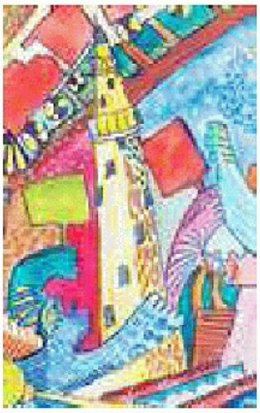

এই তো সে দিন, একুশে ফেব্রুয়ারির আগের দিন, যে একুশ বাংলা ভাষার সব চেয়ে বড় সম্মানের দিন, সে দিন আমার সেইসব অন্ধকার বইটি বাংলাদেশ সরকার নিষিদ্ধ করে দিল। কেউ ওই বই পড়তে পার বে না, ছুঁতে পারবে না, ছাপাতে পারবে না, বিলি করতে পারবে না, বিক্রি করতে পারবে না, বই থেকে কোনও উদ্ধৃতি কোথাও দিতে পার বে না। একটি প্রাণী কি বইটি নিষিদ্ধ হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে ওখানে? না। করেনি। একটি প্রাণী কি অন্তত সামান্যও দুঃখ প্রকাশ করেছে একুশেতে বই নিষিদ্ধ হল বলে! না। করেনি। হ্যাঁ, এটিও আ মার ব্যক্তিগত ব্যাপার বটে। আর, একুশের মেলাতেই যখন এক পুরুষ-লেখকের ওপর হামলা হয়, তখন কিন্তু সেটা সেই পুরুষ লেখকের ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে না, তখন সেটা সমষ্টিগত হয়ে যায়। আমি নিশ্চিত, ওই আক্রমণ যদি আমার ওপর হত, আমাকে যদি চাপাতির আঘাতে খুন করার চেষ্টা হত বা ধরা যাক খুনই করা হত, ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারই থেকে যেত। মেয়েদের জন্য তো এই ব্যাপারগুলো ব্যক্তিগতই হয়। মেয়েরা নির্যাতিতা হলে, ধর্ষিতা হলে, খুন হলে যুক্তি তো দেওয়াই হয় যে মেয়েরাই ইন্ধন জুগিয়েছে হতে। লিখতে আসা মেয়েরা যদি একা বসে কড়া কড়া কথা লিখে ফেলে, আর যদি পুরুষের পুতুল হয়ে পুরুষের মদের আড্ডায় পুরুষের নাগালের মধ্যে পুরুষের বগলতলায় বসে পুরুষকে মজা না দেয়, তবে তো বেশ্যাই ওরা। একের পর এক ওর বই নিষিদ্ধ করা হয় ও দেশে, নিজের দেশটি থেকে তাড়া খেতে হয়, দেশটিতে ওকে ঢুকতে দেওয়া হয় না, নির্বাচিত কলাম লেখার অপরাধে এক আদালত আবার ওকে এক বছরের জেল দিয়ে রেখেছে, ওর ফাঁসি হয়, হোক, ওকে কেউ যদি খুন করতে চায়, খুন করুক— এ সব কিছুর যুক্তি আমরা দাঁড় কর াতে পারি।

যুক্তিটি হল— ও যৌনতা নিয়ে লেখে, বড় বাড়াবাড়ি লেখা লেখে, ওর লেখা সাহিত্য পদবাচ্য নয়, ও লেখক নয়, ও আমাদের মতো গল্প

উপন্যাস লিখতে জানে না। ব্যস। যুক্তি দেওয়া শেষ। নটে গাছটি মুড়োলো। এই যুক্তি পুবের পুরুষেরা যেমন দেন, পশ্চিমের পুরুষেরাও আজকাল দিচ্ছেন। সময় সময় পুরুষেরা তোতাপাখির মতো হয়ে যেতে পারেন, বিপদ দেখলেই অবশ্য হন। বিপদ কেন গো? আমি কি কারও পাকা ধানে মই দিচ্ছি না কি? না দিচ্ছি না। যে যাই বলুক, তার পরও আমি চাইছি, এমন অবস্থা আসুক ও দেশে, ধনধান্য পুষ্পভরা দেশটিতে, সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দেশটিতে যেন মানুষ নিজের বাঁচার অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারে। মানুষের যেন কথা বলার অধিকার থাকে। যেন ভিন্ন মত থাকার অধিকার থাকে। কারও বই যেন পোড়ানো না হয়। আর কারও বই যেন নিষিদ্ধ করা না হয়। আমার মতো আর যেন কাউকে দেশ হারাতে না হয়। কাউকে যেন এমন ভয়াবহ রকম একা হয়ে যেতে না হয়। কাউকে যেন এত অনাথের মতো, এত এতিমের মতো পথে পথে ঘুরতে না হয়।

কেবল কি ওপার বাংলার জন্যই আমি শুভকামনাটি করব? এপার বাংলার জন্য বুঝি প্রয়োজন নেই! এপার বাংলা বুঝি খুব একেবারে গণতন্ত্রের পীঠস্থান হয়ে বসে আছে! বাক্‌স্বাধীনতা বুঝি মাগনা মেলে এ রাজ্যে? বুদ্ধবাবু জানেন, তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে তিনি কেবল এ রাজ্যেই বইটি নিষিদ্ধ করেননি, গোটা ভারতেই নিষিদ্ধ করেছেন। এমনই আইন তিনি খাটিয়েছেন যে ভারতের কোথাও অন্য কোনও ভাষাতেও দ্বিখণ্ডিত প্রকাশ হতে পারবে না। এই একবিংশ শতাব্দীতে মধ্য যুগের বায়োস্কোপ দেখালেন বটে! দেখ দেখ শাসক দেখ, দেখ দেখ শক্তি দেখ।

তবু ভাল থাকুন তিনি। বুদ্ধদেব আপনি ভাল থাকুন। ভাল থাকুন কলকাতার পঁচিশ জন বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী। ভাল থাকুন শেখ মুজাফফর হুসেন। ভাল থেকো তোমরা, আমাকে যারা ভালবাসো। ভাল থেকো আমাকে যারা ঘৃণা করো। ভাল থেকো আমার পুরনো, ভাল থেকো নতুন। ভাল থেকো যারা মুখচেনা, এখনও যারা অচেনা। ভাল থেকো কলকাতা, রোদে বৃষ্টিতে ভাল থেকো। সকাল সন্ধে ভাল থেকো। সুখে অসুখে ভাল থেকো। গঙ্গা ভাল থেকো, বৃক্ষগুলো ভাল থেকো। আকাশ তুমি ভাল থেকো। আকাশ তুমি আলো দিও। হৃদয় তুমি আলো দিও। আমি তো অচ্ছ্যুৎ, অন্ত্য, অধমাধম, আমি তো নষ্ট,

BANGLAEYE
an online service for entertainment and information
comming to see you
banglaeye services with unlimited downloads and supports for
music
news
software
tech - support
movies
radio
tutorial
forum
log on to www.banglaeye.com